بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৩ ডিসেম্বর, ২০২১ মোতাবেক ০৩ ফাতাহ্, ১৪০০ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজ হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর স্মৃতিচারণ শুরু হবে। হযরত আবু বকর (রা.)-এর নাম ছিল আব্দুল্লাহ্ এবং তাঁর পিতার নাম ছিল উসমান বিন আমের। তাঁর উপনাম ছিল আবু বকর এবং তাঁর উপাধি ছিল আতীক ও সিদ্দীক। কথিত আছে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমুল ফীল বা হস্তি বাহিনী'র আক্রমনের ঘটনার আড়াই বছর পর অর্থাৎ, ৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে। আমি পূর্বেই বলেছি, হযরত আবু বকর (রা.)-এর নাম ছিল আব্দুল্লাহ্। তিনি কুরাইশের বনূ তায়েম বিন মুর্‌রাহ্ গোত্রের সদস্য ছিলেন। অজ্ঞতার যুগে তাঁর নাম ছিল আব্দুল কা'বা কিন্তু মহানবী (সা.) তাঁর নাম পরিবর্তন করে রেখেছিলেন আব্দুল্লাহ্। তাঁর পিতার নাম ছিল, উসমান বিন আমের এবং তাঁর উপনাম ছিল আবু কোহাফা এবং তাঁর মায়ের নাম ছিল সালমা বিনতে সাখ্‌র বিন আমের এবং তার উপনাম ছিল উম্মুল খায়র। এক উক্তি মোতাবেক তাঁর মায়ের নাম ছিল, লায়লা বিনতে সাখ্‌র। হযরত আবু বকর (রা.)-এর বংশবৃক্ষ সপ্তম পূর্বপুরুষে মুর্‌রাহ্'তে গিয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে মিলে। এমনিভাবে হযরত আবু বকর (রা.)-এর মায়ের বংশধারা দাদা এবং নানা যুগপৎ উভয় দিক থেকে ষষ্ঠ পূর্বপুরুষে গিয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে মিলে। আবু কোহাফা তথা হযরত আবু বকর (রা.)-এর পিতার স্ত্রী উম্মুল খায়র তাঁর চাচার মেয়ে ছিলেন অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.)-এর মা তাঁর পিতার চাচাত বোন ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর পিতা-মাতা হযরত আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন আর তাঁরা উভয়ে তাদের পুত্র তথা হযরত আবু বকর (রা.)-এর সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যুর পর প্রথমে তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়, এরপর তাঁর পিতা ১৪ হিজরীতে ৯৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর পিতা-মাতা উভয়ের ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য হয়। তাঁর পিতার ঈমান আনার ঘটনা অনেকটা এমন, তাঁর পিতা মক্কা বিজয়ের আগ পর্যন্ত ঈমান আনেন নি। ততদিনে তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গিয়েছিল। মক্কা বিজয়ের সময় মহানবী (সা.) যখন কা'বাগৃহে প্রবেশ করেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর পিতাকে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। মহানবী (সা.) তাঁকে দেখে বলেন, আবু বকর! তুমি এই পৌঢ় লোকটিকে বাড়িতেই থাকতে দিতে, আমি স্বয়ং তাঁর কাছে যেতাম! তখন হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তাঁর আপনার কাছে উপস্থিত হওয়া অধিক যৌক্তিক, তাঁর কাছে আপনার যাওয়া নয়। নিজের পিতাকে হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে বসিয়ে দেন। মহানবী (সা.) তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে দেন এবং বলেন, ইসলাম গ্রহণ করুন, আপনি নিরাপত্তার গণ্ডিতে এসে যাবেন। অতএব, আবু কোহাফা তখন ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, আবু কোহাফা'কে মক্কা বিজয়ের দিন নিয়ে আসা হলে দেখা যায় তাঁর মাথার চুল ও দাড়ি 'সালামা'র ন্যায় শুভ্র হয়ে গিয়েছিল।

বলা হয়ে থাকে, সালামা হলো, পাহাড়ে জন্মানো শুভ্র রং-এর এক ধরনের ফুল (অর্থাৎ কাশফুলের মত)। মোটকথা, একেবারেই সাদা চুল ছিল এবং দাড়িও সাদা ছিল, তখন মহানবী (সা.) বলেন, এটিকে অন্য কোন রঙে পরিবর্তন করে দাও অর্থাৎ, দাড়িতে খেযাব (বা কলপ) লাগিয়ে দাও অথবা অন্য কোন রং করে দাও, সেটিই উত্তম হবে, তবে কালো রং করবে না। তাঁর কথার অর্থ এই নয় যে, কালো রং-এর মাঝে কোন মন্দ কিছু আছে- অর্থ হলো তিনি হয়ত ভেবে থাকবেন যে, বয়সের এ পর্যায়ে একেবারে কালো রং সেই চেহারার সাথে সম্ভবত মানানসই হবে না। যাহোক, তিনি বলেন, কোন রং ব্যবহার করা উচিত অথবা খেযাব (তথা কলপ) লাগানো উচিত।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর মা প্রাথমিক যুগে ইসলামগ্রহণকারীদের একজন ছিলেন। সীরাতে হালবিয়াতে এর উল্লেখ এভাবে রয়েছে যে, মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা যখন নিভৃতে ইবাদতের জন্য দ্বারে আরকামে অবস্থান করছিলেন আর যখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র আটত্রিশজন, তখন আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, মসজিদে হারামে চলুন। মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু বকর! আমাদের সংখ্যা অল্প, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) পীড়াপীড়ি করতে থাকেন যতক্ষণ না তিনি (সা.) সকল সাহাবীকে নিয়ে মসজিদে হারামে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সেখানে হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর উপস্থিতিতে সবার সামনে বক্তৃতা করেন। হযরত আবু বকর (রা.) বক্তৃতার মাধ্যমে লোকদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রতি আহ্বান জানান। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মহানবী (সা.)-এর পরে তিনিই প্রথম বক্তা যিনি মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বক্তব্য শুনে মুশরিকরা প্রহারের জন্য হযরত আবু বকর (রা.) ও অন্যান্য মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাঁদেরকে প্রচণ্ড মারধর করে। হযরত আবু বকর (রা.)-কে পদতলে পিষ্ট করা হয় এবং তাঁকে বেদম প্রহার করা হয়। উতবা বিন রাবিয়া হযরত আবু বকর (রা.)-কে সেই জুতাগুলি দিয়ে মারছিল যা মোটা চামড়ার তৈরি ছিল। সে জুতা দিয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর মুখে এত বেশি আঘাত করে যে, মুখ ফুলে যাওয়ার কারণে তাঁর নাক চেনা যাচ্ছিল না। অতঃপর বনূ তায়েম গোত্রের লোকেরা ছুটে আসে এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছ থেকে মুশরিকদের তাড়িয়ে দেয়। বনূ তায়েম-এর লোকেরা তাঁকে একটি কাপড়ের ওপর রেখে তাঁর বাড়িয়ে নিয়ে যায়। হযরত আবু বকর (রা.)-কে এতটাই প্রহার করেছিল যে, তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে তাদের কোন সন্দেহ ছিল না। এরপর বনূ তায়েমের লোকেরা ফিরে আসে এবং মসজিদে অর্থাৎ, খানা কা'বায় প্রবেশ করে বলে, খোদার কসম! আবু বকর যদি মারা যায় তাহলে আমরা অবশ্যই উতবা-কে হত্যা করবো, যে-কিনা সবচেয়ে বেশি মেরেছিল। এরপর তারা হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট ফিরে আসে আর তাঁর পিতা আবু কোহাফা ও বনূ তায়েমবাসী তাঁর সাথে কথা বলার চেষ্টা করে কিন্তু তিনি অচেতন থাকার কারণে কোন উত্তর দিচ্ছিলেন না। একেবারে দিনের শেষাংশে গিয়ে তিনি কথা বলেন আর সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করেন, মহানবী (সা.) কেমন আছেন? লোকেরা তাঁর কথার উত্তর দেয় নি কিন্তু তিনি বার বার একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করছিলেন। এটি শুনে তাঁর মা বলেন, **খোদার কসম! আমি তোমার সাথীর ব্যাপারে কিছু জানি না**। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর মাকে বলেন, আপনি হযরত উমর (রা.)-এর বোন উম্মে জামীল বিনতে খাত্তাব-এর নিকট যান। উম্মে জামীল (রা.) পূর্বেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু ইসলামগ্রহণের কথা গোপন রাখতেন। আপনি তার কাছে মহানবী (সা.)-এর অবস্থা জিজ্ঞেস করুন।

অতএব, তিনি অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.)-এর মা– উম্মে জামীল (রা.)-এর নিকট যান এবং তাকে বলেন, আবু বকর মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ (সা.)-এর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছে। একথা শুনে তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ-কেও চিনি না আর আবু বকরকেও না। অতঃপর উম্মে জামীল হযরত আবু বকর (রা.)-এর মাকে বলেন, আপনি কি চান যে, আমি আপনার সাথে যাই? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি অর্থাৎ উম্মে জামীল তার সাথে আবু বকর (রা.)-এর কাছে আসেন। তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে চিৎকার দিয়ে ওঠেন আর বলেন, যারা আপনার এ অবস্থা করেছে নিশ্চয়ই তারা দৃষ্কৃতকারী। আর আমি আশা রাখি, আল্লাহ্ তা'লা তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবেন। তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, মহানবী (সা.) কেমন আছেন? উম্মে জামীল বলেন, আপনার মা-ও একথা শুনছেন। তখন তিনি (রা.) বলেন, তিনি তোমার গোপন সংবাদ প্রকাশ করবেন না। এটি শুনে উম্মে জামীল বলেন, মহানবী (সা.) কুশলেই আছেন। হযরত আবু বকর (রা.) জিজ্ঞেস করেন, 'তিনি (সা.) এখন কোথায়?' উম্মে জামীল বলেন, **'দ্বারে আরকামে'**। হযরত আবু বকর (রা.)-এর রসূল প্রেমের অসাধারণ মান প্রত্যক্ষ করুন। এ কথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, 'খোদার কসম! আমি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হবার পূর্বে খাবার স্পর্শ করবো না আর পানিও পান করবো না। হযরত আবু বকর (রা.)-এর মা বলেন, 'আমরা তাঁকে অর্থাৎ আবু বকরকে কিছুক্ষণ আগলে রাখি। বাহিরে লোকদের আনাগোনা কমে যায় আর লোকেরা নীরব হয়ে যায় তখন আমরা তাঁকে নিয়ে বের হই। তিনি আমার ওপর ভরকরে হাঁটতে হাঁটতে মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছে যান। তখন হযরত আবু বকর (রা.) গভীরভাবে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। মহানবী (সা.) যখন হযরত আবু বকর (রা.)-এর এই অবস্থা দেখেন তখন তিনি চুমু দেয়ার জন্য হযরত আবু বকর (রা.)-এর দিকে ঝুঁকেন আর মুসলমানরাও তাই করে। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য নিবেদিত। লোকেরা আমার মুখমণ্ডলে যেসব আঘাত করেছে সেগুলো ছাড়া আমার আর কোন কষ্ট নেই। ইনি আমার মা যিনি নিজ পুত্রের সাথে ভালো ব্যবহার করেন। এ সংক্ষিপ্ত কথাগুলো বলেন। হতে পারে আল্লাহ্ তা'লা আপনার বদৌলতে তাকে আগুণ থেকে রক্ষা করবেন অর্থাৎ, তিনি হয়ত ঈমান আনবেন। তখন মহানবী (সা.) তার মায়ের জন্য দোয়া করেন আর তাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানান। এতে তিনি ইসলাম কবুল করেন। এভাবে হযরত আবু বকর (রা.)-এর মা শুরুতেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

সাহাবীদের জীবন চরিত সম্পর্কে রচিত একটি নির্ভরযোগ্য পুস্তক **'এসাবাহ্'** অনুসারে হযরত আবু বকর (রা.)-এর জন্ম হয় 'আমুল ফিল' (আবরাহার হস্তিবাহিনীর আক্রমণের) এর দু'বছর ছয় মাস পর। তাবারী ও তাবাকাতুল কুবরাতে লেখা হয়েছে, তিনি 'আমুল ফিল' এর তিন বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। বলা হয়ে থাকে, হযরত আবু বকর (রা.)-এর দু'টি উপাধি সুপ্রসিদ্ধ। একটি 'আতীক' আরেকটি হলো **'সিদ্দীক'**। 'আতীক' উপাধীর দেয়ার কারণ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর নিকট আসলে তিনি (সা.) বলেন انت عتيق الله من النار। অর্থাৎ, তুমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগুণ থেকে মুক্ত। তাই সেদিন থেকে তাকে **'আতীক'** উপাধি প্রদান করা হয়। কোন কোন ইতিহাসবিদের মতে 'আতীক' হযরত আবু বকর (রা.)-এর উপাধি নয় বরং নাম ছিল। তারা বলেন, এটি উপাধি নয় বরং তাঁর নাম ছিল; কিন্তু এটি সঠিক নয়। আল্লামা জালাল উদ্দীন

সুয়ুতী 'তারিখুল খুলাফা'তে ইমাম নববী'র বরাতে লিখেছেন, হযরত আবু বকর (রা.)-এর নাম আব্দুল্লাহ্ ছিল আর এটাই বেশি প্রসিদ্ধ এবং সঠিক। এটাও বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর নাম আতীক ছিল। কিন্তু সঠিক সেটিই যা সম্পর্কে অধিকাংশ আলেম একমত। তা হলো আতীক তাঁর উপাধি ছিল নাম নয়। সীরাত ইবনে হিশাম এ আতীক উপাধির কারণ এটি বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁর চেহারার সৌন্দর্য এবং তাঁর সৌন্দর্য ও সুষমার কারণে তাঁকে আতীক বলা হতো। সীরাত ইবনে হিশাম এর ব্যাখ্যায় আতীক উপাধির নিম্নলিখিত কারণসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। আতীক অর্থ, **'আল হাসান'** অর্থাৎ, উত্তম গুণাবলীর অধিকারী। অর্থাৎ তাঁকে অসম্মান ও দোষত্রুটি থেকে রক্ষা করা হয়েছে। এটাও বলা হয়ে থাকে যে, তাঁকে আতীক বলার কারণ হলো, তাঁর মায়ের কোন সন্তান বাঁচতো না। তিনি মানত করেছিলেন, যদি তাঁর গর্ভে সন্তান হয় তাহলে তিনি তাঁর নাম রাখবেন **আব্দুল কা'বা** আর তাকে কা'বার সেবায় উৎসর্গ করবেন। যখন তিনি জীবিত থাকেন এবং যৌবনে উপনীত হন তখন তাঁর নাম আতীক হয়ে গেল, অর্থাৎ তাঁকে যেন মৃত্যু থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। এছাড়াও আতীক উপাধির আরো অনেকগুলো কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। কারো কারো মতে তাঁকে আতীক বলার কারণ হলো, তাঁর বংশে এমন কোন ত্রুটি ছিল না যার কারণে তাঁর ওপর কলঙ্ক লেপন করা যেতে পারে। আতীক শব্দের আরেকটি অর্থ, প্রাচীন বা পুরোনো। এ দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত আবু বকর (রা.)-কে এজন্যও আতীক বলা হতো যে, অতীতকাল থেকেই তিনি পুণ্য ও সৎকর্ম করতেন। অনুরূপভাবে ইসলাম গ্রহণ এবং সৎকর্ম সম্পাদনে অগ্রগামী থাকার কারণে তাঁর উপাধি আতীক রাখা হয়েছিল।

এছাড়া দ্বিতীয় উপাধি **সিদ্দীক** রাখার যে কারণ বর্ণনা করা হয় তাহলো, আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী সাহেব লিখেন, সিদ্দীক উপাধির যতটা সম্পর্ক রয়েছে সে সম্পর্কে বলা হয়, অজ্ঞতার যুগে তাঁকে এই উপাধি দেয়া হয়েছিল সেই সততার জন্য যা তাঁর পক্ষ থেকে প্রকাশ পেত। আরো বলা হয়ে থাকে যে, মহানবী (সা.) তাঁকে যেসব সংবাদ দিতেন সেগুলো সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর দ্রুত সত্যায়নের কারণে তাঁর সিদ্দীক উপাধি প্রসিদ্ধি পায়। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রাতের বেলা যখন মহানবী (সা.)-কে বায়তুল মাকদাসের মসজিদে আকসায় নিয়ে যাওয়া হয়, (অর্থাৎ ইসরার ঘটনা যখন সংঘটিত হয়) তখন সকালবেলা লোকেরা এ ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের কানাঘুষা করতে থাকে। তিনি (সা.) যখন (এ বিষয়টি) বলেন, তখন লোকদের মধ্যে থেকে যারা ঈমান এনেছিল এবং তাঁকে সত্যায়নও করেছিল তারা পিছিয়ে যায়। এমন কিছু দুর্বল ঈমানের লোকও ছিল। এমন সময় মুশরিকদের মধ্য থেকে কিছু লোক হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট ছুটে এসে বলে, আপনি কি আপনার সঙ্গী সম্পর্কে জানেন, তিনি দাবি করছেন– রাতের বেলা তাঁকে বায়তুল মাকদাসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, সত্যিই কি তিনি (সা.) একথা বলেছেন? লোকেরা বলে, হ্যাঁ!। একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তিনি (সা.) যদি একথা বলে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই তা সত্য। লোকেরা বলে, আপনি কি তাঁর (একথার) সত্যায়ন করছেন যে, রাতে তিনি বায়তুল মাকদাসে গিয়েছেন আর সকাল হওয়ার আগেই ফেরত এসে গেছেন। কেননা এই বায়তুল মাকদাস মক্কা থেকে প্রায় তেরোশ' কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হ্যাঁ! আমি এর সত্যায়ন করব বরং এর চেয়ে অসম্ভব বিষয় হলেও আমি সেটিকে সত্য বলে মেনে নিব। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি তো সকাল ও সন্ধ্যায় অবতীর্ণ হওয়া ঐশী সংবাদের ক্ষেত্রেও

তাঁর সত্যায়ন করি। অতএব, এজন্য হযরত আবু বকর (রা.)-এর সিদ্দীক উপাধি প্রসিদ্ধি পায় আর তাঁকে সিদ্দীক নামে ডাকা হতে থাকে।

হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.)-এর মুক্ত ক্রীতদাস আবু ওহাব বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, যে রাতে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়, (অর্থাৎ ইসরার ঘটনায়) সেদিন আমি জিব্রাঈল (আ.)-কে বলি, অবশ্যই আমার জাতি আমাকে সত্যায়ন করবে না, (অর্থাৎ আমার কথা সত্য বলে মেনে নিবে না) তখন জিব্রাঈল বলে, **يصدّقك أبوبكر وهو الصديق** অর্থাৎ আবু বকর আপনার সত্যায়ন করবেন আর তিনি সিদ্দীক। এটি তাবাকাতে কুবরা পুস্তকে লিখা আছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনা হলো, যখন ইসরার ঘটনা সংঘটিত হয় তখন মানুষ হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট ছুটে আসে এবং তাঁকে বলে, আপনি কি জানেন, আপনার বন্ধু কী বলছেন? তিনি (রা.) জিজ্ঞেস করেন, কী বলছেন? উত্তরে তারা বলে যে, **'তিনি (সা.) বলেন, রাতে আমি বায়তুল মাকদাস থেকে ঘুরে এসেছি'**। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, মহানবী (সা.) যদি একই সাথে মে'রাজের কথাও উল্লেখ করতেন, অর্থাৎ একই সময় বলতেন বা একই ঘটনা হতো তাহলে এ অংশের জন্য কাফিররা বেশি চিৎকার-চেঁচামেচি করত। কিন্তু তারা শুধু একথা বলেছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, আমি রাতে বায়তুল মাকদাস পর্যন্ত গিয়েছিলাম। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর সত্যায়ন করলে লোকেরা তাঁকে বলে, আপনি কি এই অযৌক্তিক কথাও বিশ্বাস করবেন? তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি তো তাঁর একথাও বিশ্বাস করি যে, সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর নিকট আকাশ থেকে ঐশীবাণী অবতীর্ণ হয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মহানবী (সা.) যে, হযরত আবু বকর (রা.)-কে সিদ্দীক উপাধিতে ভূষিত করেছেন সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন যে, তাঁর মাঝে কী কী অনন্য বৈশিষ্ট্য বা পরাকাষ্ঠা ছিল। মহানবী (সা.) আরো বলেছেন, হযরত আবু বকর (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সে-ই জিনিসের জন্য যা তাঁর হৃদয়ে রয়েছে। মনোযোগ দিয়ে দেখলে বুঝা যায়, সত্যিকার অর্থেই হযরত আবু বকর (রা.) যে সততা দেখিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার আর সত্য কথা হলো, সকল যুগে যে ব্যক্তি সিদ্দীকের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চায় তার জন্য আবশ্যক আবু বকর (রা.)-এর বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি নিজের মাঝে ধারণ করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা আর এরপর যতটা সম্ভব দোয়া করা। যতক্ষণ না আবু বকর সুলভ প্রকৃতির ছাপ গ্রহণ করবে এবং সেই রঙে রঙিন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সিদ্দিকী উৎকর্ষ অর্জিত হতে পারে না।

আরো বলা হয়ে থাকে, আতীক ও সিদ্দীক ছাড়াও হযরত আবু বকর (রা.)-এর অন্যান্য উপাধিও ছিল। যেমন– **'খলীফাতু রসূলিল্লাহ্'**। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-কে **খলীফাতু রসূলিল্লাহ্**ও বলা হত। একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে, এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলে, **ইয়া খলীফাতাল্লাহে**! অর্থাৎ হে আল্লাহর খলীফা! তখন তিনি (রা.) বলেন, **খলীফাতুল্লাহ্ নয় বরং খলীফাতু রসূলিল্লাহ্**, অর্থাৎ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খলীফা আর আমি এতেই সন্তুষ্ট। সহীহ্ বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা বদর উদ্দীন আইনী বর্ণনা করেন, ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত যে, হযরত আবু বকর (রা.)-এর উপাধি **খলীফাতু রসূলিল্লাহ্** ছিল, কিন্তু এটি স্পষ্ট যে, মহানবী (সা)-এর মৃত্যুর পর তাঁর খলীফা হওয়ার দরুণ হযরত আবু বকর (রা.)-কে এই উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। এজন্য আমরা এটি বলতে

পারি না যে, এটি মহানবী (সা.)-এর যুগের উপাধি। এটি পরবর্তী যুগের কথা, এ নামটি মানুষ রেখেছে অথবা তিনিই নিজের জন্য পছন্দ করেছেন।

অপর একটি উপাধি হলো, **'আওয়াহুন'**। **আওয়াহ্** অর্থ পরম সহিষ্ণু ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী। তাবাকাতে কুবরায় লিখা আছে– হযরত আবু বকর (রা.)-কে তাঁর কোমলতা ও দয়ার্দ্রতার কারণে **আওয়াহুন** বলা হত। **'আওয়াহুম্ মুনীব'** অর্থ হলো, অত্যন্ত সহিষ্ণু ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী এবং বিনত মানুষ। তাবাকাতে কুবরায় আছে, হযরত আলী (রা.)-কে আমি মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, মনোযোগ দিয়ে শোন! হযরত আবু বকর (রা.) অত্যন্ত সহিষ্ণু, কোমল হৃদয়ের অধিকারী ও বিনত একজন মানুষ ছিলেন। মনোযোগ দিয়ে শোন! আল্লাহ্ তা'লা হযরত উমর (রা.)-কে হিতাকাঙ্খিতা প্রদান করেন যার ফলে তিনি হিতাকাঙ্খী হয়ে গেছেন।

'আমীরুশ্ শাকিরীন'– এটিও একটি উপাধি। আমীরুশ্ শাকিরীনের অর্থ হলো, কৃতজ্ঞ লোকদের সর্দার বা নেতা। অনেক বেশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে আমীরুশ্ শাকিরীন বলা হত। উমদাতুল ক্বারী পুস্তকে লিখা আছে, হযরত আবু বকর (রা.)-কে **আমীরুশ্ শাকিরীন** উপাধিতে সম্বোধন করা হত।

'সানিয়া এস্নাঈন'– এটিও একটি উপাধি। হযরত আবু বকর (রা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা **'সানিয়াস্নাঈন'** উপাধিতে সম্বোধন করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার বাণী হলো, **إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ** অর্থাৎ, **'তোমরা যদি এই রসূলকে সাহায্য নাও কর তবে (জেনে রেখো!) আল্লাহ্ তা'লা পূর্বেও তাঁকে সাহায্য করেছেন, যখন কাফিররা তাঁকে তাঁর দেশ থেকে বের করে দিয়েছিল তখন সে দু'জনের একজন ছিল যখন তাঁরা দু'জনই গুহায় অবস্থান করছিল আর সে তাঁর সঙ্গীকে বলছিল, ভয় পেও না! নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি আপন প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন'**। (সূরা আত্ তওবা: ৪১)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'লা কষ্টের সময় এবং সঙ্কটময় অবস্থায় স্বীয় নবী (সা.)-কে তাঁর মাধ্যমে সান্ত্বনা দিয়েছেন আর আস্ সিদ্দীক নাম এবং দু'জাহানের নবীর নৈকট্যের বিশেষত্ব প্রদান করেছেন। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সানিয়াস্নাঈন-এর গৌরবময় পোশাক পরিধান করিয়েছেন এবং স্বীয় বিশেষ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তোমরা এমন কোন ব্যক্তিকে চেন কি যাকে **সানিয়াস্নাঈন** নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং দু'জাহানের নবীর বন্ধু আখ্যা দেয়া হয়েছে আর এই শ্রেষ্ঠত্বের অংশীদার করা হয়েছে যে, **إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا** (অর্থাৎ, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন) এবং তাঁকে দু'জন (ঐশী) সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে একজন আখ্যা দেয়া হয়েছে? তোমরা কি এমন কোন ব্যক্তিকে চেন যার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এভাবে প্রশংসা করা হয়েছে এবং যার অজানা জীবন হতে হরেক প্রকার সন্দেহ দূর করা হয়েছে আর যার সম্পর্কে কোন ধারণাপ্রসূত সংশয়পূর্ণ কথা দিয়ে নয় বরং পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারা এটি প্রমাণিত যে, তিনি আল্লাহ্ তা'লার দরবারে গৃহীত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত? খোদার কসম! এমন সুস্পষ্ট ঘোষণা যা নিশ্চতরূপে প্রমাণিত তা কেবল হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-রই অনন্য বৈশিষ্ট্য। আমি কা'বা গৃহের প্রভু-প্রতিপালকের পবিত্র গ্রন্থসমূহে অন্য কোন ব্যক্তির জন্য এমনটি দেখি নি। অতএব, আমার এ কথায় তোমার যদি কোন সন্দেহ থাকে কিংবা তোমার এমন ধারণা হয়

যে, আমি সত্যের অপলাপ করেছি তবে কুরআন থেকে কোন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন কর এবং আমাদেরকে দেখাও যে, ফুরকানে হামীদ তথা পবিত্র কুরআন অন্য কারো জন্য অনুরূপ কথা বলেছে, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক! একথাগুলো তিনি (আ.) **সির্‌রুল খিলাফাহ্** পুস্তকে লিখেছেন।

তাঁর আরেকটি উপাধি হলো, **'সাহেবুর্ রসূল'**। এর অর্থ হলো রসূলের সঙ্গী। হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি একদল লোককে বলেন– তোমাদের মধ্যে কে (আমাকে) সূরা তওবা পড়ে শোনাবে? একজন বলে, আমি পড়ে শোনাচ্ছি। এরপর সে যখন আয়াত **إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ** অর্থাৎ, যখন সে তাঁর সঙ্গীকে বলেছিল, দুঃখিত হয়ো না'তে পৌঁছায় তখন হযরত আবু বকর (রা.) কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমিই তাঁর (সা.) সঙ্গী ছিলাম।

তাঁর আরেকটি উপাধি হলো, **'আদমে সানী'** (দ্বিতীয় আদম)। এটি হযরত আবু বকর (রা.)-এর সেই উপাধি যা হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁকে প্রদান করেন। হযরত আবু বকর (রা.)-কে তিনি দ্বিতীয় আদম আখ্যা দিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের এক রচনায় বলেন,

'হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামের দ্বিতীয় আদম আর একইভাবে হযরত উমর ফারুক এবং হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুমা যদি ধর্মের ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থেই আমানতদার বা বিশ্বস্ত না হতেন তবে আজ আমাদের জন্য পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কেও এটি বলা কঠিন ছিল যে, তা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে'।

সির্‌রুল খিলাফাহ্ পুস্তকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যা বর্ণনা করেছেন তার অনুবাদ হল,

'এবং আল্লাহ্‌র কসম! তিনি ইসলামের জন্য দ্বিতীয় আদম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মুহাম্মদ (সা.)-এর জ্যোতির প্রথম বিকাশ ছিলেন'।

তাঁর আরেকটি উপাধি হলো, **'খলীলুর্ রসূল'** (রসূলের অন্তরঙ্গ বন্ধু)। জীবনীগ্রন্থগুলোতে হযরত আবু বকর (রা.)-এর একটি উপাধি **খলীলুর্ রসূল**-ও বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর ভিত্তি হাদীসগ্রন্থগুলোতে বিদ্যমান একটি রেওয়ায়েত। মহানবী (সা.) বলেন, যদি আমি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতাম তবে তা আবু বকরকে বানাতাম। সহীহ্ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) মৃত্যুশয্যায় বলেন, আমি যদি মানুষের মধ্যে থেকে কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম তবে হযরত আবু বকরকেই অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, কিন্তু ইসলামের বন্ধুত্বই সর্বোত্তম। এই মসজিদের সবক'টি জানালা আমার পক্ষ থেকে বন্ধ করে দাও, কেবল আবু বকরের জানালা ছাড়া।

আমাদের রিসার্চ সেল এখানে একটি প্রশ্নের অবতারণা করেছে আর তাদের এ প্রশ্ন যৌক্তিকও বটে। তাদের বক্তব্য হলো, এই হাদীস থেকে কেবল একথা প্রমাণ হয় যে, মহানবী (সা.) যদি কাউকে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতেন তবে হযরত আবু বকর (রা.)-কে বানাতেন, কিন্তু তিনি তা বানান নি। এ বিষয়টিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেও একস্থানে স্পষ্ট করেছেন। যেমন– হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

মহানবী (সা.)-এর উক্তি, 'আমি যদি পৃথিবীতে কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতাম তবে হযরত আবু বকরকেই বানাতাম– বাক্যটিও ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। হযরত আবু বকর (রা.) তো

তাঁর বন্ধু ছিলেনই তাহলে একথার অর্থ কী? আসল কথা হলো, হৃদ্যতা ও বন্ধুত্ব মূলত সে সম্পর্ককেই বলে যা রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে আর এমন সম্পর্ক কেবল আল্লাহ্ তা'লারই বিশেষত্ব এবং তাঁরই জন্য নির্ধারিত। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে কেবল ভাতৃত্ব ও সম্পর্কই প্রযোজ্য। খুল্লাত-এর মর্মই হলো, তা একেবারে ভেতরে গ্রথিত হয়ে যায় অর্থাৎ খালাতের উন্নত পর্যায়ের পরিচয় হলো, খুল্লাতের উন্নত মর্যাদা তেমনিই যেমনটি কি-না ইউসুফ জুলেখার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রথিত হয়ে গিয়েছিলো। অতএব, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র বাক্যের এটিই মর্ম যে, আল্লাহ তা'লার ভালোবাসায় তো কেউ অংশিদার হতে পারে না তবে এ পৃথিবীতে যদি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতাম তাহলে তিনি হলেন, হযরত আবু বকর। আল্লাহ্ তা'লার এক স্বতন্ত্র মর্যাদা রয়েছে তাঁর মত মর্যাদা আর কেউই পেতে পারে না কিন্তু পার্থিব বন্ধুত্বের মাঝে যদি কারো সাথে বন্ধুত্ব থেকে থাকে তাহলে তা আবু বকরের সাথে রয়েছে। অর্থাৎ বন্ধুত্ব ছিল একথা ঠিক, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার বন্ধুত্বের বিপরীতে বন্ধুত্ব আছে তা কিন্তু বলা যায় না। পার্থিব মানুষের সাথে আল্লাহ্ তা'লার মত বন্ধুত্ব করা একজন নবীর জন্য বিশেষত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্য সম্ভব ছিল না, হতেই পারে না। তবে জাগতিক দৃষ্টিকোন থেকে যদি কারো সাথে বন্ধুত্ব করা যেতো তবে হযরত আবু বকর (রা.) এ মর্যাদা লাভের সবচেয়ে বেশি যোগ্য ছিলেন।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর উপনামঃ হযরত আবু বকর (রা.)-এর ডাকনাম ছিল আবু বকর এবং এই ডাকনামের একাধিক কারণও বর্ণনা করা হয়ে থাকে। কতকের মতে, 'বকর' যুবক উটকে বলা হয়। যেহেতু তিনি উট পালন এবং পরিচর্যার ক্ষেত্রে বিশেষ আগ্রহ ও দক্ষতা রাখতেন সেজন্য মানুষ তাঁকে 'আবু বকর' নামে ডাকতে আরম্ভ করেন। বাকারা-এর একটি অর্থ, জলদি করা বা সর্বাগ্রে করে ফেলাও হয়ে থাকে। কতকের মতে এই উপনামে আখ্যায়িত হওয়ার কারণ হলো, তিনি সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। **ইন্নাহু বাকারা ইলাল ইসলামে কাবলা গায়রিহি**। তিনি ইসলাম গ্রহণে অন্যদের পূর্বে অগ্রসর হয়েছেন। আল্লামা যামাখ্শারী লিখেছেন, তাঁর পবিত্র গুণাবলীর মাঝে **'ইবতেকার'** তথা সকল কাজে সর্বাগ্রে থাকার বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁকে আবু বকর নামে আখ্যায়িত করা হতো।

হুলিয়া বা দেহাবয়বঃ হযরত আয়েশা (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর দেহাবয়ব সম্পর্কে বর্ণনা করেন, তিনি এক আরব ব্যক্তিকে দেখেন যে হেঁটে যাচ্ছিল আর হযরত আয়েশা (রা.) সে সময় নিজ হাওদায় বসেছিলেন। তিনি (রা.) বলেন, আমি এই ব্যক্তির চেয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আর কোন মানুষকে দেখি নি। বর্ণনাকারী বলেন, আপনি আমাদের কাছে হযরত আবু বকর (রা.)-এর হুলিয়া বা দেহাবয়ব বর্ণনা করুন, তখন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) ফর্শা ও হ্যাংলা পাতলা ছিলেন, গালে মাংস কম ছিল, কোমর সামান্য আনত ছিল যার ফলে তাঁর লুঙ্গিও কোমরে স্থির থাকতো না বরং নিচের দিকে নেমে যেত। চেহারা ছিল স্বল্প মাংসল, চোখ ভেতরে বসা ছিল আর ললাট বা কপাল ছিল সুউচ্চ।

সহীহ্ বুখারীতে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ কাপড় হেঁচড়ে হাঁটবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার দিকে তাকিয়েও দেখবেন না। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, [হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)!] কাপড়ের ব্যাপারে আমি বিশেষ মনোযোগ না দিলে আমার কাপড়ের একাংশ**

ঝুলে থাকে অর্থাৎ এক পার্শ্ব ঢিলা থাকে যার ফলে তা নিচে নেমে যায়। মহানবী (সা.) বলেন, আপনি তো অহংকার করে এমনটি করেন না, এটি বৈধ, কোন সমস্যা নেই'।

হযরত আবু বকর (রা.) মেহেদী ও কাতমের খিযাব লাগাতেন। কাতম হলো, এক ধরনের গুল্ম যা উঁচু পাহাড়ে জন্মায়। এটি নীল (গাছের) পাতার সাথে মিশিয়ে লাগানো হয় আর এর মাধ্যমে চুল কালো করা হয়।

ইসলামগ্রহণের পূর্বে হযরত আবু বকর (রা.)-এর পেশা এবং কুরাইশদের মাঝে তাঁর মর্যাদার বিষয়ে তাবারীর ইতিহাসগ্রন্থে লেখা আছে, হযরত আবু বকর (রা.) নিজ জাতিতে অত্যন্ত সম্মানিত ও প্রিয়ভাজন ছিলেন। তিনি নম্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন। কুরাইশদের বংশধারা এবং তাদের ভালো ও মন্দ গুণাবলী সম্পর্কে তিনি সবচেয়ে বেশি অবগত ছিলেন। তিনি ব্যবসায়ী মানুষ ছিলেন এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী ও পুণ্যবান ছিলেন। তাঁর জাতির লোকেরা একাধিক বিষয়ের কারণে তাঁর কাছে আসতো এবং তাঁকে ভালোবাসতো। অর্থাৎ তাঁর জ্ঞানের কারণে, তাঁর অভিজ্ঞতার কারণে এবং তাঁর উত্তম বৈঠকে ওঠাবসার কারণে তারা তাঁর কাছে আসতো ও (তাঁকে) ভালোবাসতো।

মুহাম্মদ হোসেইন হ্যায়কল লিখেছেন, পুরো কুরাইশ জাতি পেশায় ব্যবসায়ী ছিল এবং তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি এ কাজেই নিয়োজিত ছিল। তদনুরূপ হযরত আবু বকর (রা.)ও বড় হয়ে কাপড়ের ব্যবসা আরম্ভ করেন যাতে তিনি অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেন। খুব শীঘ্রই তিনি মক্কার খুব সফল ব্যবসায়ীদের মধ্যে গণ্য হন। ব্যবসায়ীক সাফল্যের পেছনে তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এবং অতুলনীয় চরিত্রেরও বড় ভূমিকা ছিল। মহানবী (স.)-এর নবুয়্যত লাভের সময় তাঁর মূলধন ছিল চল্লিশ হাজার দিরহাম। তিনি এগুলোর মাধ্যমে দাসদের মুক্ত করতেন ও মুসলমানদের দেখাশোনা করতেন। তিনি যখন মদীনায় আসেন তখন তাঁর কাছে কেবল পাঁচ হাজার দিরহাম অবশিষ্ট ছিল।

প্রাক ইসলামিক যুগের কতিপয় ঘটনা রয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর সম্পদের প্রাচুর্য ও উন্নত চরিত্রের জন্য কুরাইশদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি কুরাইশ নেতাদের অন্যতম ছিলেন এবং তাদের পরামর্শসভার মধ্যমণি ছিলেন। তিনি সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন নেতৃস্থানীয়, সম্মানিত ও দানশীল এবং স্বীয় সম্পদ অনেক বেশি ব্যয় করতেন। (তিনি) নিজ জাতিতে সবার নয়নমণি ও প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ভালো লোকদের সঙ্গে উঠাবসা করতেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যায় তিনি লোকদের মধ্যে অধিক পারদর্শী ছিলেন। অর্থাৎ এ বিষয়ে খুব পাণ্ডিত্য রাখতেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যাশাস্ত্রের অনেক বড় আলেম ইবনে সীরীন বলেন, মহানবী (সা.)-এর পর হযরত আবু বকর (রা.) এ উম্মতের সবচেয়ে বড় স্বপ্নবিশারদ ছিলেন এবং তিনি লোকদের মধ্যে আরবদের বংশবৃক্ষ বা বংশ পরিচয় সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞান রাখতেন। জুবায়ের বিন মুতআ'ম যিনি বংশবৃক্ষ সম্বন্ধীয় জ্ঞানে শীর্ষ পর্যায়ের আলেম ছিলেন তিনি বলেন, আমি বংশবৃক্ষের জ্ঞান হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে শিখেছি। বিশেষভাবে কুরাইশের বংশ পরিচয়। কেননা, হযরত আবু বকর (রা.) কুরাইশদের মধ্যে কুরাইশের বংশ পরিচয় এবং তাদের বংশে যেসব ভালো-মন্দ দিক ছিল সে সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাদের মন্দ দিকগুলো উল্লেখ করতেন না। একারণেই তিনি হযরত আকীল বিন আবু তালেবের চাইতে তাদের মধ্যে অধিক গ্রহণীয় ছিলেন। হযরত আকীল হযরত আবু বকর (রা.)-এর পর কুরাইশদের বংশ পরিচয় এবং তাদের পূর্বপুরুষ ও তাদের ভালো-মন্দ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞান রাখতেন। কিন্তু

কুরাইশরা হযরত আকীলকে পছন্দ করতো না কেননা, তিনি কুরাইশদের মন্দ দিকগুলোও তুলে ধরতেন। হযরত আকীল আরবের বংশ পরিচয় ও তাদের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জন্য মসজিদে নববীতে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাহচর্যে বসতেন। মক্কাবাসীদের নিকট হযরত আবু বকর (রা.) তাদের মধ্যে উত্তম লোকদের অন্যতম ছিলেন। এজন্য যখনই তারা কোন বিপদে পড়ত তখন তারা তাঁর কাছে সাহায্য চাইত। মক্কায় বসবাসকারী সব গোত্রকে কা'বার সাথে সম্পর্কযুক্ত পদগুলোর বা দায়িত্বাবলীর কোন কোনটি ন্যস্ত থাকত। হাজীদের পানি এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদানের দায়িত্ব বনূ আবদে মনাফের ওপর অর্পিত ছিল। যুদ্ধের সময় পতাকা বহন, কা'বার দ্বাররক্ষকের দায়িত্ব এবং দ্বার-উন-নাদওয়ার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত ছিল বনূ আব্দুদ্ দ্বারের ওপর। সৈন্যদের পরিচালনার দায়িত্ব ছিল হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদের গোত্র বনূ মখযুমের ওপর। রক্তপন ও জরিমানা ইত্যাদি একত্রিত করার দায়িত্ব ছিল হযরত আবু বকর (রা.)-এর গোত্র বনূ তায়েম বিন মুর্‌রাহ্'র ওপর। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) যখন যৌবনে উপনীত হন তখন এ দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করা হয়। যখন হযরত আবু বকর (রা.) কোন কিছুর দিয়তের সিদ্ধান্ত দিতেন তখন কুরাইশগণ তার সমর্থন করতো এবং তাঁর নির্ধারিত দিয়তের সিদ্ধান্তের সম্মান করতো। আর তিনি ব্যতিরেকে অন্য কেউ রক্তপণের সিদ্ধান্ত প্রদান করলে কুরাইশরা তা পরিত্যাগ করতো এবং তার সমর্থন করতো না।

'হিলফুল ফুযূল'-এ হযরত আবু বকর (রা.) একজন সভ্য বা সদস্য ছিলেন। এটি ছিল সেই বিশেষ চুক্তি যা দরিদ্র এবং নির্যাতিতদের সাহায্যের জন্য ছিল। প্রাচীন যুগে আরবের কতিপয় ভদ্রলোকের হৃদয়ে এই প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, পরস্পর একজোট হয়ে এই অঙ্গীকার করা উচিত যে, আমরা সর্বদা যার যা প্রাপ্য তা অর্জনে তাকে সহায়তা করব আর অত্যাচারীকে অত্যাচারে বাধা দিব। আরবী ভাষায় যেহেতু প্রাপ্য অধিকারকে **'ফযল'**-ও বলা হয়, যার বহুবচন হলো, **'ফুযূল'**, তাই এই চুক্তির নাম **'হিলফুল ফুযূল'** রাখা হয়। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে যেহেতু এর প্রস্তাবকারীরা ছিল এমন ব্যক্তিবর্গ যাদের নামে 'ফযল' শব্দটি ছিল, তাই এই চুক্তি **'হিলফুল ফুযূল'** নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। যাহোক, ফুজ্জারের যুদ্ধের পর, আর সম্ভবত এই যুদ্ধের প্রভাবেই মহানবী (সা.)-এর চাচা যুবায়ের বিন আব্দুল মুত্তালেব-এর হৃদয়ে এই প্রেরণা জাগে যে, এই চুক্তির নবায়ন করা উচিত। অতএব, এই আহ্বানে কতিপয় কুরাইশ গোত্রের প্রতিনিধি আব্দুল্লাহ্ বিন জুদান-এর বাড়িতে সমবেত হয় যেখানে আব্দুল্লাহ্ বিন জুদানের পক্ষ থেকে একটি নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অতঃপর সবাই একজোট হয়ে প্রতিজ্ঞা করে যে, আমরা সর্বদা অত্যাচারকে প্রতিহত করব আর নির্যাতিতকে সাহায্য করব। এই চুক্তিতে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বনূ হাশেম, বনূ মুত্তালেব, বনূ আসাদ, বনূ যোহরা আর বনূ তায়েম (গোত্র) অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহানবী (সা.)ও এই উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন আর চুক্তির অংশ ছিলেন। তাই তিনি নবুয়্যতের যুগে বলতেন, আমি আব্দুল্লাহ্ বিন জুদান-এর গৃহে এমন এক অঙ্গীকারে অংশ নিয়েছিলাম যে, আজ ইসলামের যুগেও কেউ যদি আমাকে সেটির দিকে আহ্বান করে আমি তাতে সাড়া দিব।

একজন লেখক হযরত আবু বকর (রা.)-এরও **'হিলফুল ফুযূল'**-এ অংশগ্রহণের উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন যে, এই সংগঠনে মহানবী (সা.)ও অংশ গ্রহণ করেছিলেন আর তাঁর সাথে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)ও অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

নবুয়্যত লাভের পূর্বে মহানবী (সা.)-এর সাথে তাঁর সম্পর্ক এবং বন্ধুত্বের অবস্থা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনে ইসহাক এবং তিনি ছাড়া আরো কতিপয় কর্তৃপক্ষ বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) নবুয়্যত লাভের পূর্ব থেকেই মহানবী (সা.)-এর সঙ্গী ছিলেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং তাঁর পুণ্য প্রকৃতি ও উত্তম চরিত্র সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিলেন। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, অজ্ঞতার যুগেও হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর বন্ধু ছিলেন। **'সিয়ারুস্ সাহাবা'** পুস্তকে লিখিত আছে, বাল্যকাল থেকেই মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাঁর অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.)-এর বিশেষ প্রীতি ও আন্তরিকতা ছিল আর (তিনি) মহানবী (সা.)-এর বন্ধুবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অধিকাংশ বাণিজ্য যাত্রায় সফরসঙ্গী হওয়ার সম্মান (তিনি) লাভ করতেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) নবুয়্যত লাভের পূর্বে মহানবী (সা.)-এর বন্ধুবর্গের উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন,

নবুয়্যত লাভের পূর্বে মহানবী (সা.)-এর বন্ধুমহলের গণ্ডি খুবই সীমিত দেখা যায়। আসলে শুরু থেকেই তাঁর (সা.) প্রকৃতি ছিল নির্জনতা প্রিয়। আর তিনি নিজ জীবনের কোন অংশেই মক্কার সাধারণ সমাজে খুব বেশি মেলামেশা করেন নি। তথাপি কতিপয় ব্যক্তি, যাদের সাথে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, তাদের মাঝে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.) অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্ বিন আবি কোহাফা, যিনি কুরাইশদের এক সম্ভ্রান্ত বংশের সদস্য ছিলেন আর নিজ ভদ্রতা ও যোগ্যতার কারণে জাতির মাঝে খুবই সম্মানিত ছিলেন। দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন, হাকীম বিন হিযাম, যিনি হযরত খাদীজা (রা.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তিনি একান্ত ভদ্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। প্রথমদিকে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি, কিন্তু সেই অবস্থায়ও মহানবী (সা.)-এর প্রতি তিনি গভীর ভালোবাসা ও আন্তরিকতা রাখতেন। অবশেষে প্রকৃতিগত পুণ্য (তাঁকে) ইসলামের দিকে টেনে আনে। এছাড়া যায়েদ বিন আমর এর সাথেও মহানবী (সা.)-এর সুসম্পর্ক ছিল। এই ভদ্রলোক হযরত উমর (রা.)-এর নিকটাত্মীয় ছিলেন আর তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা অজ্ঞতার যুগেই শির্ক থেকে দূরে ছিলেন এবং নিজেকে ইব্রাহীম (আ.)-এর ধর্মের প্রতি আরোপিত করতেন, কিন্তু তিনি ইসলামী যুগের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

যাহোক, মহানবী (সা.)-এর সাথে (ঘনিষ্ট) সম্পর্কের দিক থেকে হযরত আবু বকর (রা.) সবার শীর্ষে ছিলেন। অজ্ঞতার যুগ থেকেই শির্ক এর প্রতি হযরত আবু বকর (রা.)-এর (চরম) ঘৃণা ছিল এবং (তিনি তা) এড়িয়ে চলতেন। হযরত আবু বকর (রা.) অজ্ঞতার যুগেও কখনো শির্ক করেন নি, আর কখনো কোন প্রতিমার সামনেও মাথা নত করেন নি। যেমন সীরাতুল হালবিয়াতে লেখা আছে, বর্ণনা করা হয় যে, নিশ্চিতরূপে হযরত আবু বকর (রা.) কখনো কোন প্রতিমাকে সিজদা করেন নি। আল্লামা ইবনে জওযী হযরত আবু বকর (রা.)-কে সেসব লোকের মধ্যে গণ্য করেছেন যারা অজ্ঞতার যুগেই প্রতিমা পূজা করতে অস্বীকার করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি কখনো প্রতিমার কাছে যান নি। অজ্ঞতার যুগে(ই) তাঁর মদের প্রতি ঘৃণা ছিল। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.) অজ্ঞতার যুগে মদকে নিজের জন্য হারাম বা অবৈধ জ্ঞান করতেন। তিনি অজ্ঞতার যুগে এবং ইসলাম গ্রহণ করার পরও কখনো মদপান করেন নি। এক রেওয়ায়েত অনুসারে, মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের বৈঠকে হযরত আবু বকর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, অজ্ঞতার যুগে আপনি কখনো মদপান করেছেন কি? উত্তরে আবু বকর (রা.) বলেন, **'আউযু বিল্লাহ্'** অর্থাৎ, আমি

আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। জিজ্ঞেস করা হয়, এর কারণ কী? হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, **'আমি আমার সম্মান রক্ষা করতাম এবং নিজের পবিত্রতা রক্ষা করতাম, কেননা যে ব্যক্তি মদপান করে সে নিজের সম্মান ও পবিত্রতা পদদলিত করে'**। বর্ণনাকারী বলেন, একথা মহানবী (সা.)-এর কানে পৌঁছলে তিনি (সা.) বলেন, **'সাদাকা আবু বকর', 'সাদাকা আবু বকর'**। অর্থাৎ, **'আবু বকর সত্য বলেছে', 'আবু বকর সত্য বলেছে'**। তিনি (সা.) একথা দু'বার বলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ করা সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে রেওয়ায়েত দেখা যায়। (এরমধ্যে) কতক বিস্তারিত আবার কতক সংক্ষিপ্ত। যাহোক, এর মধ্য থেকে কিছু বর্ণনা করছি। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, যখন থেকে আমি বুঝতে শিখেছি (তখন থেকেই) আমার পিতামাতা এই ধর্মের অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের (অনুসারী) ছিলেন। এমন কোন দিন আমরা অতিবাহিত করিনি যেদিন মহানবী (সা.) সকাল-সন্ধ্যা অর্থাৎ দু'বেলা আমাদের কাছে না আসতেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ করা সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণনা করা হয়।

যুরকানীর ব্যাখ্যায় হযরত আবু বকর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, একদিন হযরত আবু বকর (রা.) হাকীম বিন হিযাম এর গৃহে ছিলেন তখন তাঁর দাসী এসে বলে, তোমার ফুপু খাদীজা (রা.) বলছে যে, তাঁর স্বামী মূসার মতো নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। তখন হযরত আবু বকর (রা.) সবার অলক্ষ্যে সেখান থেকে বেরিয়ে যান এবং মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন আর ইসলাম গ্রহণ করেন।

সীরাত ইবনে হিশাম এর তফসীর **'আররুসুল উনুফ'** পুস্তকে হযরত আবু বকর (রা.)-এর একটি স্বপ্ন এবং ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে হযরত আবু বকর (রা.) একটি স্বপ্ন দেখেন। তিনি দেখেন যে, মক্কায় চাঁদ নেমে এসেছে। এরপর তিনি দেখেন, সেটি টুকরো টুকরো হয়ে মক্কার সর্বত্র এবং সকল গৃহে ছড়িয়ে পড়েছে। এর এক একটি টুকরো প্রত্যেক গৃহে প্রবেশ করেছে, এরপর সেই চাঁদকে যেন তাঁর কোলে একত্রিত করে দেওয়া হয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) কোন কোন আহলে কিতাব আলেমের কাছে এই স্বপ্নের উল্লেখ করলে তারা এর এই ব্যাখ্যা করেন যে, যার জন্য প্রতীক্ষা করা হচ্ছে সেই নবীর যুগ এসে গেছে এবং আপনি সেই নবীর অনুসরণ করবেন আর এ কারণে আপনি মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান হবেন। এরপর মহানবী (সা.) যখন হযরত আবু বকর (রা.)-কে ইসলামের দাওয়াত দেন তখন তিনি আর বিলম্ব করেন নি।

সাবিলুল হুদা পুস্তকে হযরত আবু বকর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ সংক্রান্ত একটি রেওয়ায়েত এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, কা'ব বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ ছিল আকাশ থেকে অবতীর্ণ একটি ঐশী বাণী। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো এই যে, হযরত আবু বকর (রা.) ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি একটি স্বপ্ন দেখেন এবং সেই স্বপ্ন তিনি বহীরা রাহেবের(সন্যাসী) কাছে বর্ণনা করেন। তখন সন্ন্যাসী বহীরা তাঁকে জিজ্ঞেস করে যে, আপনি কোথা হতে এসেছেন? তিনি (রা.) বলেন, মক্কা থেকে। তিনি জিজ্ঞেস করেন মক্কার কোন গোত্র থেকে? তিনি উত্তরে বলেন, কুরাইশ গোত্র থেকে। তিনি জিজ্ঞেস করে, আপনি কী করেন? তিনি উত্তরে বলেন, আমি ব্যবসায়ী। তখন সন্ন্যাসী বহীরা বলেন, **'আল্লাহ তা'লা আপনার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন**

করলে আপনাদের গোত্রের মধ্যে থেকে একজন নবীর আগমন ঘটবে। আপনি সেই নবীর জীবদ্দশাতেই তাঁর সাহায্যকারী হবেন আর তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর খলীফা হবেন'। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) এই কথা গোপন রাখেন যতদিন না মহানবী (সা.)-এর অভ্যুদয় ঘটে। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি যে দাবি করছেন এর সপক্ষে দলীল কী? অন্যান্য রেওয়ায়েতে কোন দলীল চাওয়ার উল্লেখ নেই, যাহোক, এই রেওয়ায়াতে এটি বর্ণিত হয়েছে। মহানবী (সা.) বলেন, সেই স্বপ্ন যা তুমি সিরিয়ায় দেখেছিলে, সেটাই (এর) প্রমাণ। এতে হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-কে আলিঙ্গন করেন এবং তাঁর কপালে চুমু খান আর বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহ্ তা'লার রসূল।

এই রেওয়ায়েতে হযরত আবু বকর (রা.)-এর একটি স্বপ্নের উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু তার বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেয়া হয়নি যে, সেই স্বপ্নে হযরত আবু বকর (রা.) কী দেখেছিলেন। কিন্তু সীরাতে হালবিয়া থেকে জানা যায়, এটি সেই স্বপ্নের দিকেই ইঙ্গিত করছে যাতে হযরত আবু বকর (রা.) দেখেছিলেন যে, চাঁদ খণ্ডবিখণ্ড হয়ে পতিত হয়েছে, যার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। এ পর্যায়ে হযরত আবু বকর (রা.) এই স্বপ্নটি সন্ন্যাসী বহীরার কাছে বর্ণনা করেছিলেন। যাহোক, এ সংক্রান্ত আরো অনেক বর্ণনা জীবনী লেখকরা লিখেছেন যা ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)